Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 154-159
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পরিকাঠামো সম্পর্কে একটি আলোচনা

Rabiul Islam
Research Scholar, University of Delhi, Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, Delhi, India

Abstract

The discussion about the infrastructure of the magazine or journal published in west Bengal depends on the base of that particular place. If the infrastructure is good enough then there are many opportunities to publish the magazine. But what do we actually mean by the term infrastructure of publishing. In this article we want to say that term implies the printing system, reader, capital and communication. Based on this the traits of the magazine of one region are changed. This issue will be discussed in the following article.

Key words: Magazine, Journal, Infrastructure, Publication, Printing system, Reader, Capital, Communication.

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পত্রপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রাণকেন্দ্র। পত্রপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে লাভজনক-অলাভজনক, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক নানারকমের পত্রিকা এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়। আর সঙ্গত কারণেই ব্রিটিশ সংবাদপত্র এই শহরের নাম রেখেছিল 'পত্রিকানগরী'(স্বপন বসু, মুনতাসীর মামুন(সম্পাঃ) ,২০০৫,৭)। কেননা পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রান্তের তুলনায় এই শহরেই সবচেয়ে বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কলকাতায় এতো পত্রিকা প্রকাশের কারণ কি? অন্য কোনো স্থানে কেন নয়? অবশ্য অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হিসাবে কলকাতার সঙ্গে অন্য কোনো স্থানের তুলনা করা যায় কিনা তা নিয়ে মুনতাসীর মামুন তাঁর 'উনিশ শতকে সংবাদ-সাময়িকপত্রের কাঠামো, স্থায়িত্ব,প্রচার ও বিপণন' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "উনিশ শতকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা বা অভিন্ন বাংলা থেকে কত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও, স্বপন বসু-র হিসাবমতো সে সংখ্যা 'বারোশোর কম নয়'। এবং স্বাভাবিকভাবেই ১৮৫৭ সালের পর প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেশি। এসব সংবাদ-সাময়িকপত্রের অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার কেন্দ্র বা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা থেকে। অবশ্য, সারা ভারতবর্ষের রাজধানী হিসাবে কলকাতার বিষয়টি অন্য কোনো শহরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবে মফস্‌সল তো বটেই, সুদূর পল্লিগ্রামে থেকেও পত্রিকা প্রকাশের ঘটনা অভূতপূর্ব ছিল না।"[১](মুনতাসীর মামুন,২০০৫,১৩)

বিশ শতকেও কলকাতা শহরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবার ধারাটি অব্যাহত থাকে। এর প্রমাণ স্বরূপ ২০০১ সালে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র 'বাংলা লিটল ম্যাগাজিন তথ্যপঞ্জী'টিকে দেখে নেওয়া যেতে পারে।(পবিত্র সরকার, সন্দীপ দত্ত,২০০১) এই তথ্যপঞ্জীতে জেলাভিত্তিক লিটল ম্যাগাজিনের নাম দেওয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়— উত্তর চব্বিশ পরগণাতে ৫৪ টি, উত্তর দিনাজপুরে ৬টি, কলকাতাতে ৩১০টি, কোচবিহারে ৯টি, জলপাইগুড়িতে ১২টি, দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ৬০টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭টি, দার্জিলিং-এ ১২টি, নদিয়াতে ৯৭টি, পুরুলিয়াতে ২৩টি, বর্ধমানে ৫০টি, বাঁকুড়াতে ২১টি, বীরভূমে ২২টি, মালদহে ১১টি, মেদিনীপুরে ৫৭টি, মুর্শিদাবাদে ১৪টি, হাওড়াতে ৪০টি ও হুগলিতে ৫৫টি পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল। এই তথ্যপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা মিলিয়ে যত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সমসংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন শুধুমাত্র কলকাতাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু কলকাতাতে এতো পত্রিকা প্রকাশের কারণ কি? এর কারণ হিসাবে বলা যায়, ম্যাগাজিন প্রকাশে কলকাতার আর্থ-ভৌগলিক পরিবেশ যে ভাবে সাহায্য করেছে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন স্থানে সেই সুবিধাটি পাওয়া যায় না। এখানে আর্থ ভৌগলিক পরিবেশ বলতে ভৌগলিক অবস্থান, পুঁজি, মুদ্রণশিল্প, পাঠক, যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। আর এই সমস্ত উপাদানগুলির তারতম্যের ফলে কোনো স্থানের পত্রপত্রিকার প্রচার ও প্রসার ঘটে। এর মূল কারণ আর্থ ভৌগলিক পরিকাঠামো। এবার আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

প্রথমেই পত্রিকা প্রকাশের পুঁজির উৎস সন্ধান করা যাক। পত্রিকাতে পুঁজি প্রধানত চার ভাবে আসে—১) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, ২) সংগঠন দ্বারা বিনিয়োগ, ৩) বিজ্ঞাপনদাতাদের বিনিয়োগ ও ৪) গ্রাহক চাঁদা। সংবাদ-সাময়িকপত্রের শুরুর দিকে পত্রিকাগুলি বেশিরভাগ ধনী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতো। যেমন ১৮৭০-৮০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষাতে ২১টি পত্রিকার মধ্যে ১৭টি ছিল একক উদ্যোগে আর ৪টি ছিল যৌথ উদ্যোগে। (মুনতাসীর মামুন,২০০৫, ১৩) আর এই সমস্ত পত্রিকাই ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। অপরদিকে যদি আমরা ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গের দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব যে, সেখানকার পত্রিকা প্রকাশের পিছনে উচ্চবিত্তদের ভূমিকা বেশি ছিল। মফঃস্বলের জমিদারেরা পত্রিকা প্রকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র নাম উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাটি তৎকালীন নদীয়া (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালি গ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থ সাহায্যে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রায় ১৮ বছর চলেছিল। (শিপ্রা দস্তিদার, ৫মে ২০১৪, কাঙাল হরিনাথ,বাংলাপিডিয়া) এছাড়া বাংলা ভাষার প্রথম আঞ্চলিক পত্রিকা 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। তবে কলকাতাতে ধনী পরিবারের সাময়িকপত্রিকাকে অর্থ সাহায্য করার প্রবণতা বেশি ছিল।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে পত্রিকার মালিকানা ও পুঁজির উৎসের পরিবর্তন হয়ে যায়। এর মূলে ছিল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে পত্রিকাগুলির মালিকানার দুটি চরিত্র লক্ষ্য করা যায়—

১) একক প্রচেষ্টায় পত্রিকা প্রকাশ। যেমন 'সবুজপত্র'(১৯১৪),'অভিযান'(১৯৩১), 'আহুতি'(১৯৪১)প্রভৃতি।
২) সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ। সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশ শতকে পরিবর্তন দেখা যায় । উনিশ শতকে প্রধানত ধর্মীয় সংগঠনেরই পত্রিকা চোখে পড়ে। যেমন, তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা(১৮৪৩), হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র 'হিন্দু হিতৈষিণী'(১৮৬৫), বৌদ্ধ সমিতির 'বৌদ্ধবন্ধু'(১৮৮৪) ও নুর অল ইমান সংগঠনের 'নুর অল ইমান'(১৯০০) প্রভৃতি। আর বিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মীয় সংগঠনের পাশাপাশি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মালিকানাতে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন, কায়স্থ সমাজের 'কায়স্থ সমাজ'(১৯১৯) ও 'কায়স্থ'(১৯২৩), তন্তুবায় সম্প্রদায়ের 'তন্তু ও তন্ত্রী'(১৯২৫), মোদক সম্প্রদায়ের 'মোদক হিতৈষিণী'(১৯২৫), বৈদ্য সমাজের 'সেনভূমি'(১৯১৯), কর্মকার সম্প্রদায়ের 'কর্ম'(১৯১৬), তিলি সমাজের 'তিলি সমাচার'(১৯১৯), তেলী সমাজের 'তেলী বান্ধব'(১৯২৪), জারিকারক সম্প্রদায়ের 'নবজীবন'(১৯২১), নমঃশূদ্র জাতির 'নমঃশূদ্র হিতৈশী'(১৯১৬), আহ্‌লে হাদিস সম্প্রদায়ের 'আহ্‌লে হাদিস'(১৯১৫),গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের 'গন্ধবণিক'(১৯২২), প্রভৃতি।

পত্রিকার পুঁজির একটি অন্যতম উৎস হল বিজ্ঞাপন। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম থেকেই এই বিষয়টি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আছে। সরকারী ও বেসরকারী বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে ছাপানো হয়। এর বিনিময়ে পত্রিকার কিছু আয় হয়। কিন্তু কোন একটি সংস্থা বিজ্ঞাপন সেই পত্রিকাকেই দেয়, যে পত্রিকার সার্কুলেশন বেশি। এক্ষেত্রে গ্রাম বা অন্যান্য স্থানের চেয়ে কলকাতার পত্রিকা বেশি বিজ্ঞাপন পায়।

অর্থাৎ বিশ শতকে পত্রিকা প্রকাশে পুঁজির কোনোরকম অভাব ছিল না। কলকাতা শহরে পত্রিকা প্রকাশের পিছনে এই চার রকমের পুঁজিই ছিল। অবশ্য পুঁজি থাকলেই পত্রিকা প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন মুদ্রণ শিল্প, ও পাঠক সমাজ। কারণ এই সমস্ত উপাদানই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এবার আসা যাক মুদ্রণশিল্প প্রসঙ্গে। সংবাপত্র-সাময়িকপত্র বা লিটল ম্যাগাজিন যাইহোক না কেন তা ছাপানোর জন্য মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতক থেকেই কলকাতায় মুদ্রণশিল্পের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে গোয়াতে। বাংলাতে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার হয়। কলকাতাতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৭৭৭ সালে। এই ছাপাখানার মালিক ছিলেন জেমস্ অগাস্টাস্ হিকি। জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতার মুদ্রণশিল্পে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। এরপরে ১৭৭৮ সালে বাংলাতে ছাপাখানা স্থাপন করেন অ্যানড্রুজ সাহেব। তাঁর এই ছাপাখানা থেকে হালহেদের ব্যকরণ প্রকাশিত হয়। তবে এই ছাপাখানাটি প্রথম হুগলিতে স্থাপিত হয়ে পরে মালদহে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় কলকাতাতে ১৭ টি ছাপাখানা গড়ে ওঠেছিল। (শ্রীপান্থ, ১৯৯৬,১৪) এই ভাবে কলকাতাকে কেন্দ্র করে মুদ্রণশিল্প গড়ে উঠতে থাকে। মুদ্রণশিল্পের প্রভাবে ১৭৮০ থেকে ১৭৯০সালের মধ্যে কলকাতাতে ১৯টি সাপ্তাহিক ও ৬টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছাপাখানা সংখ্যাতে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কালি ও কাগজের। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে কাগজ ও কালি আনা ছিল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে কলকাতার চৌরঙ্গীতে ১৭৯০ সালে 'ক্যালকাটা পেপার মিল' ও ১৭৯২ সালে বাঁকিপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় কাগজের মিল তৈরী হয়। ১৮১১ সালে হুগলীর শ্রীরামপুরে, ১৮৬৭ সালে বালিতে ১৯০৫ সালে টিটাগড়ে কাগজকল গড়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাঠকের চাহিদার কারণে মুদ্রণশিল্প যে কলকাতাকেন্দ্রিক গড়ে উঠছিল, তা কলকাতাকেন্দ্রিক পত্রিকা প্রকাশকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছে। উনিশ শতকে কলকাতাতে পাড়ায় পাড়ায় ছাপাখানা দেখা যায়। যেমন, কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, শাঁখারীটোলাতে বদন পালিতের প্রেস, আরপুলিতে শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেস, শ্রীমন্ত রায়ের প্রেস, বহুবাজারের শ্রীলেবেডার সাহেবের ছাপাখানা, শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, মোং ইটালিতে শ্রীযুত পিয়ার্স সাহেবের ছাপাখানা, সমশুল আখবার প্রেস প্রভৃতি। এই শতকে কলকাতায় মুদ্রাযন্ত্র প্রসার এতো বাড়ে যে, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর এক সংবাদপত্র তাদের প্রতিবেদনে জানায়—

> "দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কণ কার্যের অপূর্বরূপ
> বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ভূরি ঐ যন্ত্রালয়
> স্থাপিত হইয়াছে। তদক্ষ্যরা এইক্ষণে প্রতিযোগিতারূপে
> এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথবা
> অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন।"[২](শ্রী অতুল সুর,১৯৮৬,২১)

বিশ শতকে যেমন পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়ে তেমনি ছাপাখানার সংখ্যাও বাড়ে। নিচে ১৯১৫ সালের কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের কিছু ছাপাখানার নাম ও সেই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নাম দেওয়া হল—

কলকাতা

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
১. নিউ এজ প্রেস	আল-এসলাম(১৩২২)
২.সরস্বতী প্রেস	বৌদ্ধ বন্ধু(১৩২২)
৩.মানসী প্রেস	মর্মবাণী(১৩২২)
৪. সুহৃৎ পেস	তুলসীপত্র(১৩২২)
৫.ইসলামিয়া প্রেস	আহ্‌লে হাদিস(১৩২)
৬.শিশু প্রেস	ঝঙ্কার(১৩২২)

৭.বাণী প্রেস	ধন্বন্তরী(১৩২২)
৮.মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস	বাঁশরী(১৩২২)
৯.কারমাইকেল প্রেস	ক্ষত্রিয় বান্ধব(১৩২২)
১০.হিতবাদী স্টীম মেশিন যন্ত্র	বৈদ্য সঞ্জীবনী(১৩২২)

বাংলার অন্যান্য স্থান

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
১.করিমগঞ্জ প্রেস(শ্রীহট্ট)	শ্রীভূমি(১৩২২)
২.জগৎ আর্ট প্রেস(ময়মন সিংহ)	সন্তোষ(১৩২২)
৩.মজুমদার প্রেস(বহরমপুর)	স্টুডেন্টস রিভিউ(১৩২২)

এই তালিকা দেখে অনুমান করা যায় যে, মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে পত্রপত্রিকার সংখ্যাও সমগ্র বাংলার(অবিভক্ত বাংলা) তুলনায় কলকাতায় থেকে বেশি ছিল। একটি হিসাব অনুসারে বিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতাতে প্রায় ৬০০০ ছাপাখানার পরিচয় পাওয়া যায়।(ডঃ অতুল সুর,১৯৯০,১৮৭) তবে এখানে একটি ব্যাপার জেনে নেওয়া ভালো, শুধুমাত্র পত্রিকার জন্যই ছাপাখানা স্থাপন হয়নি, এই সব ছাপাখানাতে প্রচুর বইও ছাপা হতো।

গবেষণাপত্রের এই অংশটি আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি ম্যাগাজিনের পরিকাঠামোতে কোন কোন উপাদান কাজ করে এবং কিভাবে অর্থনৈতিক ভূগোল পত্রিকার প্রকাশে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গেই মুদ্রণশিল্পের কথা উঠে এসেছে। এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কলকাতার মুদ্রণশিল্প কলকাতার পত্রপত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। শহর কলকাতার নাগালের মধ্যে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবার ফলে সহজেই কোনো একজন ব্যক্তি পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে উৎসাহ পেত। উনিশ শতকের শেষের দিকে মুদ্রণশিল্পের প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়। বর্তমানে মুদ্রণ পদ্ধতি লেটারপ্রেস-লিথোঅফসেট-ফোটোগ্রাভিয়র-সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং ছাড়িয়ে ডিজিটাল প্রিন্টিঙে প্রবেশ করেছে। আধুনিকতার হাত ধরে মুদ্রণশিল্পের বিস্তার এখন অনেক বেশি। এক্ষেত্রেও কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান থেকে অনেক এগিয়ে। ফলে অন্যান্য প্রকাশনার সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশও ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

এবার আসা যাক পাঠক প্রসঙ্গে। যেকোনো শিল্প সাহিত্যের চারটি উপাদান থাকে(ফারুক ওয়াসিফ,২০০৭,১৯২) — ১) শিল্প বস্তু, ২) শিল্পী বা লেখক, ৩) জগৎ এবং ৪) উপভোক্তা বা পাঠক-দর্শক। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই থাকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক বা উপভোক্তার মননের উপভোগ্য বস্তু হয়ে ওঠা। সাহিত্য-শিল্পে শিল্পী বা লেখকের আদর্শের সঙ্গে পাঠক একাত্ম হয়ে বৌদ্ধিক সুখ অনুভব করে। তবে পাঠকের বিভিন্ন শ্রেণী আছে। যেমন, সাহিত্যরীতি অনুসারে উপন্যাসের পাঠক, গল্পের পাঠক, প্রবন্ধের পাঠক, কবিতার পাঠক প্রভৃতি। আর এই সমস্ত পাঠক তার রুচি বা পছন্দ অনুযায়ী শিল্প-সাহিত্যকে গ্রহণ করে। তবে সমস্ত জায়গার পাঠকশ্রেণী একধরনের নাও হতে পারে এবং একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিল্প সাহিত্যের আলাদা আলাদা পাঠক বা উপভোক্তা হতে পারে। অর্থাৎ কলকাতাতে যদি সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা বেশী থাকে তবে অন্যান্য জেলাগুলিতে সাহিত্যের পাঠক বেশি থাকবে এমন নয়। উদাহরণ স্বরূপ কলকাতার মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে পাঠ্যবস্তু(কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ) কেন্দ্রিক পাঠকশ্রেণী এবং নদিয়াতে গীতিনাট্যকে কেন্দ্র করে দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, স্থানভেদে সমাজের অন্যান্য উপাদানের (শিক্ষা, ঐতিহ্য, উপভোক্তা) সঙ্গে পাঠক শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটে। এই কারণেই কলকাতা ও জেলাগুলিতে পত্রিকার বিষয় নির্বাচনের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। কারণ কলকাতা ও অন্যান্য জেলার পাঠকের মনের চাহিদা এক নয়। এছাড়াও পত্রিকার সম্পাদকের আদর্শ, ব্যক্তিগত রুচি, দায়বদ্ধতার কারণেও পত্রিকার বিষয়বস্তু পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিশ শতকে বাংলার পত্রিকাগুলির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত কলকাতা ও জেলার পত্রপত্রিকার বিষয়ভিত্তিক নমুনা দেওয়া হল—

কলকাতাতে বিষয়ভিত্তিক পত্রপত্রিকা (১৯১৫-১৬)

বিষয়	পত্রিকার নাম
সাহিত্য	‘মর্মবাণী’(১৩২২),‘বাঁশরী’(১৩২২),‘নৈবেদ্য’(১৩২২)

	'মানসী ও মর্মবাণী'(১৩২২), 'প্রতিধ্বনি'(১৩২৩), 'পরিচারিকা'(১৩২৩), 'আখ্যান'(১৩২৩) প্রভৃতি
ধর্ম	'আল-এসলাম'(১৩২২), 'বৌদ্ধবন্ধু'(১৩২২) প্রভৃতি 'আহ্‌লে হাদিস'(১৩২২), 'প্রীতি-বার্তা' (১৩২২), 'ইসলাম বার্তা'(১৯১৬),প্রভৃতি
বিজ্ঞান	'যোগবল'(১৩২২), 'সচিত্র সাধন বিজনান' (১৩২৩) প্রভৃতি
শিক্ষামূলক	'ধন্বন্তরী'(১৩২২) প্রভৃতি
জাতি/গোষ্ঠী/সম্প্রদায় বিষয়ক	'ক্ষত্রিয়-বান্ধব'(১৩২২), 'কর্ম'(১৩২৩), 'পতাকা' (১৩২৩), 'সুবর্ণবণিক-সমাচার'(১৩২৩) প্রভৃতি
আয়ুর্বেদ	'বৈদ্য সঞ্জীবনী'(১৩২২) প্রভৃতি
বিবিধ বিষয়	'ছাত্ররঞ্জন'(১৩২৩), 'অনাথ বন্ধু'(১৩২৩) প্রভৃতি

জেলাগুলিতে বিষয়ভিত্তিক পত্রপত্রিকা (১৯১৫-১৬)

বিষয়	পত্রিকার নাম
সাহিত্য	'বঙ্গমহিলা'(রাজশাহী),'শ্রীভূমি'(শ্রীহট্ট), 'সন্তোষ'(ময়মনসিংহ),'সুদর্শন'(মেদিনীপুর) প্রভৃতি
শিক্ষামূলক	'ষ্টুডেন্টস রিভিউ' (বহরমপুর), 'প্রবর্তক' (চন্দন নগর) প্রভৃতি
ধর্ম	'সঙ্গিনী সজ্জনতোষিণী'(নদিয়া) প্রভৃতি

১৯১৫-১৬ সালে কলকাতা ও জেলাগুলির বিষয় চয়নে যদি আমরা তুলনা করে দেখি যে, তাহলে দেখবো— জেলাগুলি থেকে কলকাতার বিষয়বৈচিত্র বেশী। আর এখানেই প্রমাণিত হয় যে, একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের পাঠকশ্রেণী ও সম্পাদকের পছন্দের কারণে উপর নির্ভর করেই পত্রিকার বিষয় নির্বাচন করা হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা পত্রিকা প্রকাশের একটি প্রধান উপাদান। লেখা নেওয়া এবং তা ছাপানোর পর পাঠক ও গ্রাহককে পত্রিকাটি পৌঁছে দেওয়া পত্রিকার একটি অবশ্য করণীয় কাজের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে ডাক ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উনিশ শতকে ডাক ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। এই কারণে কলকাতাতে প্রকাশিত পত্রিকা মফঃস্বলে পৌঁছাত দেরী হতো। মফঃস্বলের কোন পাঠককে পত্রিকার সংখ্যা পাবার জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো। এর মূল কারণ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাতে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময় কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ-রাজমহল প্রভৃতি স্থানে ডাক ব্যবস্থা চালু হয়। এই সময়ের ডাক ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র সরকারী চিঠিপত্রই আদানপ্রদান হতো। সাধারণ মানুষ ডাক ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা পেত না। ফলে বেসরকারীভাবে বণিক সম্প্রদায় ও জমিদারেরা তাদের নিজেদের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের জন্য নিজস্ব ডাক ব্যবস্থা চালু করে। পরবর্তীকালে সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা ও জেলা সৃষ্টি হলে ডাক ব্যবস্থার আরো উন্নতি হয়। ডাক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল অঞ্চলগুলি থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে জ্ঞানের ও সাংস্কৃতিক বিনিময় অনেক সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে শতাব্দীতে প্রযুক্তির হাত ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ইন্টারনেটের দৌলতে এখন কোন লেখা আদানপ্রদান কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পত্রিকাও তার প্রকাশ পদ্ধতি পালটেছে। এখনকার পাঠককে আর ডাক ব্যবস্থার উপর ভরসা করতে হয় না। তারা নিজের বাড়িতে বসেই পছন্দের পত্রিকাটির 'ডিজিটাল ভার্সন' পেয়ে যাচ্ছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা লিটল ম্যাগাজিন এখনও এই প্ল্যাটফর্মটিকে আত্মস্থ করতে পারেনি। ফলে পত্রিকা আর পাঠকের সঙ্গে একরকম ভৌগলিক দূরত্ব থেকেই গেছে।

তথ্যসূত্রঃ-

১। স্বপন বসু, মুনতাসীর মামুন, ২০০৫, 'দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র, পুস্তক বিপনি, কলকাতা
২। অতুল সুর, ১৯৮৬, 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর', বিদ্যা গ্রন্থমালা,কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থঃ-

১। গীতা চট্টোপাধ্যায়,১৯১৪, ‘বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ১৯১৫-১৯৩০’, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা

২। গীতা চট্টোপাধ্যায়,২০০১, ‘বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ১৯৩১-১৯৪৭’, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা

৪। শ্রীপান্থ, ১৯৭৭, ‘যখন ছাপাখানা এল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

৫। ড.দিলীপ মজুমদার, ২০১০, ‘বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য’, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা

লিটল ম্যাগাজিনঃ-

১। সরকার আশরাফ(সম্পাদক),২০০৭ ‘নিসর্গ’,বর্ষ ২১, সংখ্যা ১, ঢাকা

ওয়েব সাইটঃ-

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE, 12/02/2018